বস্তুসার
(Abstract)

উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণ এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল— যার ফলে বাংলা সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই একটা বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। বাংলার নবজাগরণের পূর্বে বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজ নারীদের ভোগ্যপণ্য হিসেবেই বিবেচনা করতো। রক্ষণশীল সমাজ তথা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মনে করতো নারীদের জন্মই হয়েছে যেন স্বামীকে সন্তুষ্ট করে সন্তানের তথা পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্যে এবং স্বামী ও পরিবারের সকলের সেবা করার জন্যে। রক্ষণশীল সমাজ নারীদের শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছিল। এছাড়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্ট বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, সতীদাহপ্রথা প্রভৃতি নারীদের জীবনকে নরকযন্ত্রণা ভোগেরই সামিল করে তুলেছিল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের এই নিম্ন অবস্থানের জন্যেই উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে প্রগতিশীল মানুষদের ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তনে বাংলায় যেসব সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সেগুলির অধিকাংশই নারীকেন্দ্রিক। আর নারীকেন্দ্রিক সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলির মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হল নারী শিক্ষা আন্দোলন। নারী শিক্ষা আন্দোলনের ফলে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীদের প্রাথমিক শিক্ষা মোটামুটিভাবে সমাজে স্বীকৃত হলে এদেশের স্বল্পসংখ্যক নারী ধীরে ধীরে শিক্ষিতা হয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে আবার কয়েকজন নারী চিঠিপত্র লেখালেখির পাশাপাশি তাঁদের নিজস্ব জীবনদর্শন, জীবন-যন্ত্রণার কথা আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতে থাকেন। আবার এসময় ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তনে অনেকে অন্যের লেখনীর সাহায্যেও নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এভাবেই উনিশ শতকে আমরা পেয়ে যাই কয়েকজন প্রতিভাশালী লেখিকাদের— যাঁদের মধ্যে রাসসুন্দরী দাসীর *আমার জীবন*, সারদাসুন্দরী দেবীর *আত্মকথা*, কৈলাসবাসিনী দেবীর *ডায়েরী*, প্রসন্নময়ী দেবীর *পূর্ব্বকথা*, বিনোদিনী দাসীর *আমার কথা*, কৃষ্ণভাবিনী দাসীর *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*, নিস্তারিণী দেবীর *সেকেলে কথা*, কামিনী রায়ের *শ্রাদ্ধিকী*, সুদক্ষিণা সেনের *জীবন স্মৃতি*, শরৎকুমারী দেবের *আমার সংসার*, ইন্দিরা দেবীর *আমার খাতা*, মানকুমারী বসুর *আমার অতীত জীবন*, লীলাবতী মিত্রের *জীবনকথা*, আমোদিনী দাশগুপ্তের *আমার জীবন-কাহিনি*, মনোদা দেবী দাশগুপ্তার *জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী*— এই পনেরোজন লেখিকার পনেরোটি আত্মকথাকে

আমরা গবেষণাকর্মের জন্যে নির্বাচন করেছি।

এই নির্বাচিত আত্মকথাগুলি নিয়ে কেন আমাদের গবেষণা— এ প্রশ্ন অনায়াসেই এসে যায়। এর উত্তরে বলা যায়, নারী রচিত এসব আত্মকথায় উনিশ শতকের সমাজে তাঁদের অবস্থান এবং সমাজে প্রচলিত বহু কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, নারী শিক্ষা, নারীবাদী ভাবনা, আধ্যাত্মিক ভাবনা, ব্রাহ্মসমাজের কথা, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরোধ প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে— যা উনিশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির নির্ভরযোগ্য দলিল হয়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে এই বিষয় নিয়ে গবেষণাকর্মের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। তবে কয়েকটি গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণনামূলক রীতিতে এসব আত্মকথা নিয়ে আলোচনা করা হলেও সংস্কৃতির নানা দিক সেসব গ্রন্থে আলোচিত হয়নি। আবার কয়েকটি গ্রন্থে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির মধ্যে কয়েকটি আত্মকথার উপর ভিত্তি করে মূলত তৎকালীন সময়ে নারীদের সামাজিক অবস্থান দেখানো হয়েছে। আমরা নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে লেখিকাদের ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনির পাশাপাশি তৎকালীন সময়ের সমাজ ও সংস্কৃতির নানা দিক দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই গবেষণাকর্মে যে দিকগুলি দেখানো হয়েছে, তা পূর্বে কোনো গবেষক বা লেখক দেখাননি বলে আমার ধারণা। এই গবেষণাকর্মটিতে দেখানো হয়েছে উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ফলে এদেশের স্বল্পসংখ্যক মানুষের ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তনে এতদিনের স্থবির সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের চিত্রকে। আর সমাজ ও সংস্কৃতির এই পরিবর্তন মূলত সূচিত হয়েছে নারীকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকে নারীদের সামাজিক অবস্থান ও তার পরিবর্তন, নারী শিক্ষার সূচনা, নারীদের ব্যক্তিসত্তার জাগরণ, নারীদের আধ্যাত্মিক জীবন প্রভৃতি বিষয়কে এই গবেষণাকর্মে তুলে ধরা হয়েছে নির্বাচিত আত্মকথাগুলিকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতির এসব বিষয়ের অন্বেষণ ও বিশ্লেষণই এই গবেষণাকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

উপরিউক্ত বিষয়গুলিকে আমরা সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। সব শেষে আছে উপসংহার অংশ।

প্রথম অধ্যায়: উনিশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপট: নারী ভাবনার উন্মেষ

দ্বিতীয় অধ্যায়: উনিশ শতকের লেখিকাদের পরিচিতি এবং তাঁদের রচনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

তৃতীয় অধ্যায়: নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : নারী শিক্ষার প্রসঙ্গ

চতুর্থ অধ্যায়: নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : সামাজিক নানা প্রসঙ্গ

পঞ্চম অধ্যায়: নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : নারীবাদী ভাবনা

ষষ্ঠ অধ্যায় : নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : আধ্যাত্মিক ভাবনা

সপ্তম অধ্যায়: নারীর আত্মকথায় উনিশ শতক : ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গ

উপসংহার

প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে নবজাগরণের প্রভাবে নারীদের সামাজিক শোষণের হাতিয়াররূপী বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধে এদেশের কিছু শিক্ষিত প্রগতিশীল মানুষদের সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন। আর উনিশ শতকে নবজাগরণের ফলপ্রসূত এসব সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনে কীভাবে নারী প্রগতিশীল ভাবনার সূচনা ও বিস্তার ঘটেছিল— তা এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে উনিশ শতকে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার প্রচলনে বহু নারী লেখাপড়া শিখে নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় রূপ দিতে থাকেন। এই অধ্যায়ে আমরা নির্বাচিত পনেরোজন লেখিকাদের পাশাপাশি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রিয়ম্বদা দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, হেমাঙ্গিনী দেবী, হেমলতা সরকার, সরলাদেবী চৌধুরাণী, রাজলক্ষ্মী দেব্যা, সরোজকুমারী গুপ্তা প্রমুখ উনিশ শতকের লেখিকাদের এবং তাঁদের রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে অনেক গৃহস্থ পরিবার, খ্রিস্টান মিশনারি, ব্রাহ্মসমাজ— এদের প্রচেষ্টায় স্বল্পসংখ্যক নারীর শিক্ষা লাভ, বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নারী শিক্ষার প্রকৃত সূচনা এবং বিদ্যাসাগরের হাতে নারী শিক্ষার বিস্তৃতি। আর আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে উনিশ শতকে নারী শিক্ষা প্রচলনে এসব প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ কীভাবে উঠে এসেছে— তা এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিকে কেন্দ্র করে দেখানো হয়েছে উনিশ শতকে এদেশের সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, নারীদের আব্রুপ্রথা, হিন্দু বিধবা নারীর নির্জলা একাদশী পালন, সামাজিক ও শাস্ত্রীয় নানা বিধি-নিষেধ প্রভৃতি এদেশের নারীদের জীবনকে যন্ত্রণাময় করে তুলেছিল। পাশাপাশি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত জাত-পাতের দ্বন্দ্ব, একঘরে প্রথা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাবু বিলাস, হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সামাজিক নানা প্রসঙ্গ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে তথাকথিত অর্থে নারীবাদী ভাবনা ফুটে না উঠলেও সেগুলিতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের পরাধীন জীবন-যাপন,

শোষণ-যন্ত্রণা প্রভৃতি বর্ণনার পাশাপাশি কখনো কখনো পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সনাতন ঐতিহ্য, বিধি-নিষেধ প্রভৃতিকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে নারীবাদী ভাবনার প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল— যা বিশ শতকে এদেশের লেখিকাদের হাতে পূর্ণতা পায়। আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিতে এই নারীবাদী ভাবনার প্রেক্ষাপট নানা প্রসঙ্গে কীভাবে উঠে এসেছে— তা এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা নিজেদের জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি প্রত্যাশায় সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়ার জন্যে কীভাবে আধ্যাত্মিক ভাবনায় বড় বেশি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। আর লেখিকাদের এই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসই জীবনে চলার পথে কীভাবে তাঁদের জীবনদর্শন, মূল্যবোধ তৈরি করে দিয়েছে— এই অধ্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা উনিশ শতকে নারী শিক্ষার সূত্রপাত হলে স্বল্প লেখাপড়া শিখে নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে বিস্তর ব্যাকরণ-শৈলী-বানান প্রভৃতি ভুল-ত্রুটি করেছেন। তবে তাঁরা ব্যাকরণ-শৈলী-বানান প্রভৃতি ভুলত্রুটি করলেও তাঁরা নিজেদের সামাজিক অবস্থান ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক পৃথক ভাষা ব্যবহারে, একান্ত নিজস্ব নারী ভাষার ব্যবহারে, নিজস্ব বলার ভঙ্গির গুণে এবং সহজ-সরল ভাষার ব্যবহারে কীভাবে সেকালের সাপেক্ষে স্বতন্ত্র ভাষার ব্যবহার করেছিলেন— তা এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলিকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকে এদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থান ও সংস্কৃতির নানা দিকের সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। গবেষণাকর্মের সাতটি অধ্যায়ে উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রভাবে নারীকেন্দ্রিক সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে নারী মুক্তির ভাবনা, নারী শিক্ষা প্রচলনে স্বল্পসংখ্যক নারীর শিক্ষা লাভ করে সাহিত্য সৃষ্টি, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নারী শিক্ষার সূচনা, উনিশ শতকে এদেশের সামাজিক নানা প্রথা-সংস্কার, নারীদের আধ্যাত্মিক চেতনা, নারীদের ব্যক্তিসত্তার জাগরণ প্রভৃতি বিষয়ের উদ্‌ঘাটনে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির ভূমিকার মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া উনিশ শতকের এদেশের সমাজ-সংস্কৃতি ও নারীর বিশ্বস্ত চিত্র স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহারে তুলে ধরে আমাদের নির্বাচিত আত্মকথাগুলির লেখিকারা যে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়েছেন— তারও মূল্যায়ন করা হয়েছে এখানে।